ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের
মুসলিম নিধন প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের

মুসলিম নিধন প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল-হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

প্রকাশনা

সূচিপত্র

ভূমিকা

সম্মানিত তাওহীদবাদী ভাই ও বোনেরা! মুহতারাম উস্তাদ আবু আনোয়ার আল-হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ'র 'ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম নিধন -প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়' নামক গুরুত্বপূর্ণ এ রিসালা বই আকারে আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান। গুরুত্বপূর্ণ এই লেখায় তিনি ভারতীয় হিন্দুদের মুসলিম নিধনের ভয়াবহ প্রস্তুতির ইতিহাস বিস্তারিত তুলে ধরেন। নিঃসন্দেহে এই প্রবন্ধে আমরা আমাদের করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনাও পাব ইনশাআল্লাহ।

এই লেখাটির উর্দু সংস্করণ ইতোপূর্বে 'জামাআত কায়িদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ শাখা'র অফিসিয়াল উর্দু ম্যাগাজিন 'নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ' এর জানুয়ারি ২০২২ ইংরেজি সংখ্যায় (بھارت کی ہندتوا تحریک نسل کشی کی تیاری کے مراحل میں) 'ভারত কি হিন্দুত্বওয়া তেহরীক নসল কাশি কি তইয়্যারী কে মারাহেল মেঁ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই লেখাটির বাংলা অনুবাদ এখন ঈষৎ পরিমার্জিত হয়ে বইরূপে আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

আম-খাস সকল মুসলিম ভাই ও বোনের জন্য এই রিসালাহটি ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে। সম্মানিত পাঠকদের কাছে নিবেদন হল-আমরা লেখাটি গভীরভাবে বারবার পড়ব, এবং করণীয় সম্পর্কে সচেতন হব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ এই রচনা কবুল ও মাকবুল করুন! এর ফায়দা ব্যাপক করুন! আমীন।

সম্পাদক

২৭শে জুমাদাল উখরা, ১৪৪৩ হিজরি

৩০শে জানুয়ারি, ২০২২ ইংরেজি

উপমহাদেশের মুসলিমরা ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।এই প্রক্রিয়া, শত বছরের অধিককাল যাবত চলমান। বর্তমানে এটি দ্রুত গতিশীল হচ্ছে। হিন্দু রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে এই আন্দোলনের উত্থান হয়। আজ তা প্রকাশ্যে মুসলিম গণহত্যা ও জাতিগত নিধনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে । এতে এই আন্দোলনের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।

বর্তমান বাস্তবতায় এ সমস্যা কেবল হিন্দুস্তানের নয়;বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান। মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মত তথা মুসলিম উম্মাহ এক জাতি। উপনিবেশবাদী কাফেরগোষ্ঠীর সিদ্ধান্তে যে রাষ্ট্রীয় সীমা ও সীমান্ত রচিত হয়, তা কৃত্রিম রেখা ছাড়া আর কিছুই নয়; শরীয়তের দৃষ্টিতে এর কোন মূল্য নেই।আর এ-সমস্ত সীমান্ত রচনার উদ্দেশ্যই হল উম্মাহকে বিভক্ত ও দুর্বল করা । তাই হিন্দুস্তানের তথা ভারতের মুসলিমদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিতকারী বিষয়গুলো গোটা উম্মাহর জন্যও হুমকিস্বরূপ। কেননা আবহমান কাল থেকেই উপমহাদেশের প্রায় সত্তর কোটি মুসলমানের ভাগ্য পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। তাই পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বসবাসরত মুসলিমদের দৃষ্টি ভারতে বসবাসকারী বিশ কোটি মুসলিমদের জাতিগত নিধন থেকে সরানো কোন ক্রমেই ঠিক হবে না।

জাতিগত নিধনের আহ্বান

২০২১ সালের শেষের দিকে ১৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর, তিন দিনব্যাপী উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা বড় ধর্মীয় বৈঠক আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠিত এই সভায় হিন্দুদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সাধু-সন্তরা মুসলিম গণহত্যার জন্য প্রস্তুতির প্রকাশ্য আহ্বান জানায়। তারা হিন্দুদেরকে উৎসাহিত করে অস্ত্র ক্রয় এবং অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য। স্পষ্ট ভাষায় তারা গণহত্যা এবং জাতিগত নিধনের জন্য অনুপ্রাণিত করে; হিন্দুস্তান থেকে ‘জিহাদি’দের (মুসলিমদেরকে) উচ্ছেদের আহ্বান জানায়।

এটি গণহত্যার প্রকাশ্য আহ্বান। এ অনুষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ ও মনোনীত সদস্যরা স্পষ্ট ভাষায় মুসলিমদেরকে হত্যা করা, জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা অথবা পিটিয়ে তাদেরকে ভারত থেকে বহিষ্কারের জন্য সশস্ত্র বাহিনী গঠনের সংকল্প প্রকাশ করে। এভাবে তারা হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চায়। এই সভাকে 'ধর্ম সংসদ' নাম দেয়া হয়। অবাক করা বিষয় হল এই সভায় আলোচনার শিরোনাম দেয়া হয়, 'ইসলামী ভারতে সনাতন ধর্মের ভবিষ্যৎ: সমস্যা ও সমাধান'।

'ধর্ম সংসদ' হিন্দুদের ধর্মীয় সভা। এতে হিন্দুধর্মের নেতৃবৃন্দ এমন বিষয়াবলী নিয়েই চিন্তা-ফিকির ও সিদ্ধান্ত দেন, যা হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়, ১৯৮৪ সালে রাম জন্মভূমি আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্তও এরূপই এক 'ধর্ম সংসদে' স্থির হয়। উক্ত আন্দোলনের সূচনার আট বছর পরই তারা বাবরি মসজিদকে শহীদ করে দেয়।

হরিদ্বারের সভায় যা বলা হয় এবং যতটা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়, তা অত্যন্ত ভয়াবহ। এতে হিন্দুস্তানের মালাউন মুশরিকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়। আর এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পন্থাও তারা স্পষ্ট করে। তবুও যদি মুসলমানরা গাফিল-উদাসীন দশা থেকে জাগ্রত হয়ে , ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করে, তবে শীঘ্রই আমাদের এবং নিজ সন্তান-সন্ততি তথা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কবর নিজেরাই খনন করব।

'ধর্ম সংসদে' যা আলোচনা হয়, তার কিছু অংশের ওপর দৃষ্টিপাত করা যাক –

উক্ত সভার অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যতি নরসিংহানন্দ, ঘোষণা করে:

> "মুসলিমদেরকে হত্যা করার জন্য তরবারি যথেষ্ট নয়। আমাদের তরবারির চেয়েও ভাল অস্ত্র চাই।"

যতি নরসিংহানন্দ মুসলিম গণহত্যার উদ্দেশ্যে কাজ করা, হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ এক নেতা । বিগত কয়েক বছরে সাধারণ হিন্দু যুবকদেরকে সংগঠিত করা এবং তাদের নেটওয়ার্ক তৈরিতে সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।যাতে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর জন্য মিলিশিয়া বাহিনী গঠনে খুব

বেশি কষ্ট না হয়, সে জন্যই তার এই প্রচেষ্টা। ভবিষ্যতে যুবকদের এই সংগঠন ও নেটওয়ার্ক খুব দ্রুতই মিলিশিয়ার রূপ ধারণ করবে, তা সহজেই অনুমেয়।

উক্ত সভার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি প্রবোধানন্দ গিরি, উত্তর প্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের অত্যন্ত কাছের মানুষ। সে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের জাতিগত নিধনের উদাহরণ দিয়ে ঘোষণা করে:

> "সময় আর বাকি নেই। এখন কেবল দুটো অপশন আছে। হয় নিজেরা মরার জন্য তৈরি হও অথবা মুসলিমদেরকে হত্যা করার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। এছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। এ কারণে এখানেও (অর্থাৎ ভারতেও) মিয়ানমারের মত স্থানীয় পুলিশ, রাজনীতিবিদ, সেনাবাহিনী এবং প্রত্যেক হিন্দুর জন্য উচিত হল, তারা অস্ত্র বহন করবে এবং উচ্ছেদ অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এছাড়া সমাধানের আর কোন পথ নেই।"

হিন্দু মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারি পূজা শাকুন পান্ডে নামক নারী মুসলিমদেরকে গণহারে হত্যার প্রকাশ্য আহ্বান জানিয়ে বলে:

> "অস্ত্র ছাড়া কিছুই সম্ভবপর নয়। আপনাদের যদি তাদের (মুসলিম) জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন করতে হয়, তাদের হত্যা করুন। তাদের হত্যা করতে প্রস্তুত হন এবং জেলে যেতে প্রস্তুত হন। যদি আমাদের মাত্র ১০০ সৈন্যও থাকে এবং তাদের ২০ লাখকে যদি আমরা হত্যা করি, আমরা বিজয়ী হব।
>
> নাথুরাম গডসের মত আমিও নিন্দিত হতে প্রস্তুত আছি। হিন্দুত্বের রক্ষায় এমন যেকোন শয়তানকে-যে আমার ধর্মের জন্য হুমকি, প্রতিরোধ করার জন্য আমি অস্ত্র তুলব।"

হিন্দুরা নিজেদেরকে অন্ততপক্ষে তরবারি দিয়ে যেন অস্ত্রসজ্জিত করে এবং লাখ টাকার অস্ত্র ক্রয় করে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দেয় সাগের সিন্ধু নামক এক বক্তা। উক্ত বক্তা মুসলিমদেরকে আর্থনীাতিক ও সামাজিকভাবে বয়কট করার কথা বলে।

মুসলিমদের ভূমি ক্রয় করে সমস্ত গ্রাম যেন মুসলিমদের থেকে পবিত্র করা হয়, এমন আহ্বানও জানায়।

অপর এক হিন্দু লিডার আনন্দস্বরূপের ভাষ্য এমন ছিল:

> "যদি সরকার আমাদের দাবি (মুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠিন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা) মেনে না নেয়, তবে আমরা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি ভয়ানক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ব।"

সে-সঙ্গে এই লিডার হিন্দুদেরকে অস্ত্র ক্রয়ের জন্য উৎসাহিত করে বলে:

> "আমি বারবার বলছি, যদি মোবাইল প্রয়োজন হয় তাহলে তার জন্য ৫০০০ রাখ, কিন্তু অস্ত্রের জন্য খরচ কর ১ লাখ রুপি।"

সভার শেষদিকে বাচ্চারা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে প্রদর্শনী করে আর তখন মাইক্রোফোনে ঘোষণা হতে থাকে:

> "অপরাধীদেরকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা প্রত্যেকের আবশ্যকীয় কর্তব্য। এই লড়াকু বাচ্চারা বিধর্মীদেরকে হত্যা করার জন্য।"

খোলাসা করে বললে, ঐ সভার আহ্বান এই ছিল—

- হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিমদের সঙ্গে সংঘর্ষের কোন বিকল্প নেই।
- হিন্দুদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা একান্ত জরুরী।
- মুসলিমদেরকে আর্থনীতিক ও সামাজিকভাবে বয়কট করা উচিত। নিজেদের এলাকা থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করা উচিত।
- ভারতকে মুসলিম মুক্ত করার কোন বিকল্প নেই।

- ধর্ম সংসদের মত সভা ও বৈঠকগুলোর মাধ্যমে উচ্ছেদ অভিযানগুলোর সূচনা করা হবে এবং নেতৃত্ব দান করা হবে।

এই সভার পরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমন কতক ভিডিও সকলের সামনে চলে আসে যেখানে দেখা যায়, শিশু-কিশোর ও পূর্ণবয়স্কদেরকে নানা জায়গায় – স্কুলে, গ্রামের ক্ষেত-খামার ও ময়দানে কিংবা এয়ারকন্ডিশন কনফারেন্স রুমে – লড়াই করা, হত্যা করা, হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুবরণ করা এবং শত্রুকে হত্যা করার মর্মে শপথ করান হচ্ছে। এমনিভাবে মুসলিমদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে বয়কট করারও অঙ্গীকার করান হচ্ছে। মুসলিমদের সঙ্গে সর্বপ্রকার লেন-দেন পরিহার করার কথাও বলা হয়। এমনকি পার্লামেন্টের কতক সদস্য পর্যন্ত মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা অথবা তাদেরকে এলাকা থেকে মেরে পিটিয়ে বের করে দেয়ার ওপর জোরারোপ করে।

এখানে আরও একটি বিষয় আমাদের বুঝা উচিত, এই সভা ও বৈঠক, এ জাতীয় চিন্তাধারার অধিকারী ও সমমনা লোকদের কোন বিচ্ছিন্ন বৈঠক নয়। অনুষ্ঠানের পর অনলাইনে বিপুল সমর্থন অর্জন করে এই সভা।

গবেষকদের মতে, জাতিগত নিধন কার্যক্রম এক দফা বা পর্যায়ে আরম্ভ হওয়ার মত কোন কার্যক্রম নয়। বরং এটা এমন এক বিষয়, যা অত্যন্ত সতর্কতা ও ধীরগতি সত্ত্বেও নিয়মতান্ত্রিক পরিকল্পনা করেই বাস্তবায়ন করতে হয়। ঐ সকল গবেষকের দৃষ্টিতে, জাতিগত নিধনের দশটি স্তর আছে:

প্রথম স্তর, বিভাজন বা গ্রুপিং (অর্থাৎ কোন বিশেষ গ্রুপকে নির্ধারণ ও বিশেষায়ন। আমরা এবং তোমরা বলে বিভক্ত করা।

দ্বিতীয় স্তর, লক্ষণ চিহ্নিত করা (অর্থাৎ ঐ গ্রুপকে বিশেষ কোন লক্ষণের সঙ্গে জুড়ে দেয়া)

তৃতীয় স্তর, বিশেষভাবে পৃথকীকরণ (অর্থাৎ ঐ গ্রুপকে অন্যদের থেকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা। বিশেষ করে সামাজিক ও আইনগতভাবে।)

চতুর্থ স্তর, অমানবিকভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা (মানব গুণাবলী ও বিশেষণ থেকে বঞ্চিত করে পশুর মত কিংবা এজাতীয় ঘৃণিত বলে বিচার করা। অর্থাৎ ঐ বিশেষ গ্রুপকে সাধারণ মানবিক গুণাবলীর অধিকারী হিসেবে মেনে না নেয়া।)

পঞ্চম স্তর, সংগঠন ও সংঘবদ্ধতা (অর্থাৎ সশস্ত্র প্রশিক্ষিত সংঘবদ্ধ বাহিনী ও মিলিশিয়া তৈরি করা; উক্ত সম্প্রদায় কিংবা গোষ্ঠীকে ধ্বংসের জন্য)

ষষ্ঠ স্তর, প্রান্তিকতা (তথা আমরা এবং তোমরা বলে বিভক্তি তৈরি কৃত বিভক্তিকে প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে প্রান্তিকতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।)

সপ্তম স্তর, প্রস্তুতি গ্রহণ (তথা এ স্তরে দুটি ধাপ। প্রথম ধাপ লক্ষ্য নির্ধারণ; গণহত্যা পরিচালনার প্রস্তুতির জন্য । আর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল, উক্ত লক্ষ্য পূরণের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা।)

অষ্টম স্তর, পশ্চাদ্ধাবন ও নিপীড়ন (তথা এ স্তরে প্রথমে, ঐ গ্রুপের সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে উক্ত এলাকা থেকে বহিষ্কার করা, জোরপূর্বক গুম করা, লুণ্ঠন-নিপীড়ন ও হত্যা করা। তৃতীয়ত তথা সর্বোপরি বিভিন্ন ক্যাম্পে তাদেরকে স্থানান্তরিত করা।)

নবম স্তর, মূলোচ্ছেদ (তথা পরিকল্পিত সংঘবদ্ধ গণহত্যা করা, যাতে উক্ত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মূলোচ্ছেদ করা যায়।)

দশম স্তর, প্রতিক্রিয়া রোধ (অর্থাৎ এ স্তরে নিগৃহীত গ্রুপের পক্ষ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া আসলে তাও দমন করা হয়।)

হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন বর্তমান সময়ে **ষষ্ঠ স্তর** অতিক্রম করে এখন **সপ্তম স্তর অর্থাৎ প্রস্তুতি গ্রহণের পর্যায়ে অবস্থান করছে।** এই স্তরকে ব্যাখ্যা করে আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘Genocide watch’ এভাবে বলেছে:

> “জাতীয় নেতা অথবা জাতিগত নিধনের পরিকল্পনাকারী গ্রুপের নেতারা প্রথমে, অনুসারীদের সামনে ‘টার্গেট গ্রুপ’-এর প্রাসঙ্গিক সমস্যার

চূড়ান্ত সমাধান পেশ করে থাকে। দ্বিতীয়ত, তারা নিজেদের দৃঢ়সংকল্প ও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাগুলোকে চটকদার শব্দের পোশাক সজ্জিত করে বৈধতা দানে প্রয়াসী হয়। যেমন, জাতিগত শুদ্ধি অভিযান, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, উচ্ছেদ অভিযান ইত্যাদি শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করে। তৃতীয়ত, তারা সেনাবাহিনী, মিলিশিয়া ও সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত করতে থাকে। চতুর্থত, অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করতে থাকে এবং নিজেদের মিলিশিয়া ও বাহিনীগুলোকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে থাকে। পঞ্চমত, টার্গেট গ্রুপের ব্যাপারে জনমনে ভীতি, ঘৃণা ও ক্রোধ সঞ্চার করতে থাকে।

সর্বোপরি, নেতৃবৃন্দ অধিকাংশ সময় এই দাবি করে যে, 'যদি আমরা তাদেরকে হত্যা না করি তাহলে তারা আমাদেরকে হত্যা করবে'। এভাবেই জাতিগত নিধনকে প্রতিরোধ প্রচেষ্টার রূপ দেয়া হয়। অগ্নিঝরা বক্তব্য ও ঘৃণা-উদ্রেককারী প্রোপাগান্ডা সহসাই খুব বেশি মাত্রায় হতে দেখা যায়। সেগুলোর পেছনে উদ্দেশ্য থাকে, টার্গেট গ্রুপের ব্যাপারে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে দেয়া।"

গবেষকদের মতে সপ্তম স্তরের যে ব্যাখ্যা আমরা দেখতে পেলাম, সেটাকে যদি হরিদ্বারের শুদ্ধি অভিযান, সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ এবং মুসলিমদেরকে হত্যার প্রতি সাধারণ আহ্বানের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে বাস্তবতা অনুধাবনের ক্ষেত্রে কোন সংশয়-সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

শুধু তাই নয়, বরং জাতিগত নিধনের এই দশটি স্তর বিন্যাসকারী এবং জেনোসাইড ওয়াচ-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর গ্রেগোরি এইচ স্ট্যান্টোন (Gregory H Stanton)-এর মতে, ভারত জাতিগত নিধনের অষ্টম স্তরে পৌঁছে গেছে। তা হল পশ্চাদ্ধাবন ও নির্যাতন-নিপীড়নের স্তর। ১০ই জানুয়ারি ২০২২-এ তারা ভারতের জন্য জেনোসাইড ইমারজেন্সি এলার্ট জারি করে। একটি অনলাইন কনফারেন্সে সকলকে সম্বোধন করে বলে যে, ভারত আজকে অষ্টম স্তরে পৌঁছে গেছে। নিজেদের টার্গেট গ্রুপ তথা মুসলিমদেরকে চূড়ান্তভাবে উচ্ছেদের স্তরে যেতে তাদের কেবল এক কদম দূরত্ব রয়েছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হিন্দুত্ববাদী বাহিনী মুসলিমদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলার জন্য দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে।

প্রতিক্রিয়া

জাতিগত নিধনের এই প্রকাশ্য আহ্বান সত্ত্বেও ভারতীয় মিডিয়া এ বিষয়টাকে ধামাচাপা দিতে এবং এ থেকে সর্বসাধারণের দৃষ্টি সরাতে সব চেষ্টা ব্যয় করে। ভারতে চার শ'র বেশি টুয়েন্টি ফোর আওয়ারস সংবাদ প্রচারকারী টিভি চ্যানেল এবং এক লাখেরও বেশি প্রচার মাধ্যম থাকা সত্ত্বেও অনুষ্ঠিত ধর্ম সংসদ সম্মেলন এবং ইন্টারনেটে সেই সভার সমর্থনে মুসলিম বিরোধিতার বহমান সুনামি সম্পর্কে কোন পত্রিকা-ই প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদ ছাপায় নি; বরং ভিতরের পৃষ্ঠায় ক্ষুদ্র আকারে এই সংবাদ প্রকাশ করে।

মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার ঐ সমস্ত সাধু-সন্তের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। কেবল কিছু এফআইআর করা হয়, শুধু ফর্মালিটি হিসেবে। বক্তাদের মাঝে কেউই তাদের ভাষণ ও বক্তব্য নিয়ে লজ্জিত বা অনুতপ্ত নয়। বিপরীতে তারা অনেক বেশি গর্বিত ও আত্মবিশ্বাসী।

যতি নরসিংহানন্দ সভায় প্রদত্ত সকল বক্তব্যের ব্যাপারে গর্ব প্রকাশ করে বলেছে যে,

> "আমি কি জন্য অনুতপ্ত হব? হিন্দুরা প্রথমবারের মত জেগে উঠছে। এর জন্য তো আমার গর্ব হয়।"

এমনিভাবে প্রবোধানন্দ গিরি তার অটল অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে এভাবে যে, এ বক্তব্যের জন্য তার কোন লজ্জা বা অনুতাপ নেই, এতে কেবল নিজ মত প্রকাশের স্বাধীনতাই প্রকাশ পেয়েছে।

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে আরও তিনটি এরূপ ধর্ম সংসদ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। ভবিষ্যতে এমন আরও অনেক সংসদ অনুষ্ঠানের জোর সম্ভাবনা রয়েছে। এ থেকে দৃশ্যমান, সাধু-সন্তদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, সরকার তাদের বিরুদ্ধে বাস্তবে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। আর তাদের এমন দৃঢ় বিশ্বাসের কারণ হল, বিজেপি ও আরএসএসও হিন্দুস্তানের জন্য এমন দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করে।

অবশ্য এই ঘটনার প্রতি নিন্দা জানায় কতক লিবারেল সমালোচক। তবে ভারতের অধিকাংশই সেক্যুলার শ্রেণি এ বিষয়ে নীরব। তাদের এই নীরবতা অর্ধেক সম্মতি বটেই, বরং পূর্ণ সম্মতির কথাই আমাদেরকে জানান দিচ্ছে। উদাহরণত বলা যায়, সাবেক ভারতীয় নেভি চীফ অরুণ প্রকাশ অপর তিন সাবেক নেভি চীফ এবং জনৈক সাবেক এয়ার ফোর্স চীফ ধর্ম সংসদের ঐ সভার ব্যাপারে ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি একটি খোলা চিঠি লিখেন। সরকার উক্ত চিঠির কোন জবাব দেয়নি, আর তাদের দেয়া পরামর্শ বাস্তবায়নও করেনি। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, অরুণ প্রকাশের মতে, জনৈক সাবেক আর্মি চিফ ঐ চিঠিতে স্বাক্ষর করতে আগ্রহী হয়নি। প্রকাশ এ বিষয়কে প্রকারান্তরে হরিদ্বারের চেতনার প্রতি তাদের মৌন সমর্থন বলে বিবেচনা করেন।

ইন্টারভিউতে অরুণ প্রকাশ ভারতে গৃহযুদ্ধের অবস্থা তৈরি হওয়ার ব্যাপারে আশঙ্কা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন:

> “মুসলিমদের পক্ষ থেকে অবশ্যই অবশ্যই এর প্রতিক্রিয়া আমাদের সামনে আসবে....” এবং “পরবর্তী স্তর হবে লড়াই ও সংঘর্ষের।”

যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ‘আপনি কি বোঝাচ্ছেন, ভারত গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন’? তখন অ্যাডমিরাল প্রকাশ জবাব দেন:... “জি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক এটাই... আমরা কি এটা চাই?...”

এমনিভাবে বলিউডের অভিনেতা, পুরোদস্তর সেক্যুলার নাসিরুদ্দিন শাহও নিজ উদ্বেগ প্রকাশ করে উক্ত সভার ব্যাপারে বলেন:

> “তারা যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে, তা রীতিমত একটি গৃহযুদ্ধের ডাক। আমাদের বিশ কোটি সদস্যকে এত সহজে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যাবে না। আমরা বিশ কোটি সদস্য পাল্টা লড়াই করব।.... এবং আমার বিশ্বাস, যদি এ ধরনের কোন আন্দোলন শুরু হয়, তবে সেটাকে অকল্পনীয় প্রতিক্রিয়া, অচিন্তনীয় ক্রোধ ও ক্ষোভের মুখোমুখি হতে হবে।”

তার এ বক্তব্য সাধারণ কোন বিষয় নয়। এ বক্তব্য জোরালোভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরোপুরিভাবে ভারতীয় ‘গান্ধীবাদী সেক্যুলার নমনীয়তা’ নীতির কট্টর সমর্থক গোষ্ঠীটিও যদি জাতিগত নিধনের এই বাস্তবতার সীমাহীন ভয়াবহতা অনুধাবন করত এবং তা মেনে নিতে বাধ্য হয়, তাহলে পরিস্থিতি কতটা ভয়ানক তা কী অনুমান করা যায়?!

গণহত্যার বিরাট কর্মযজ্ঞ

জাতিগত নিধনের এই পরিকল্পনা কেবল হিন্দু ধর্মাবলম্বী নেতৃবৃন্দ অথবা বিজেপি, আরএসএস কর্মী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, ভয়াবহ ‘ইসলামোফোবিয়া’ গোটা হিন্দুস্তানের সমাজে ছড়িয়েছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করা যুবকেরাও হিন্দুত্ববাদীদের জাতিগত নিধনের বিরাট প্রকল্পে পুরো অংশ নিচ্ছে এবং মুসলিমদেরকে বিশেষত মুসলিম মা-বোনদেরকে পশুর চেয়েও অধম প্রমাণ করায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

মুসলিম মা-বোনদের প্রোফাইল ছবিসহ অ্যাপ ডেভেলপারেরা ২০২১ সালের জুলাই মাসে ‘Sully Deals’ নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করে। যাতে তারা ঐ সমস্ত মা-বোনকে Deal of the day (আজকের কেনাবেচার পণ্য) বলে অভিহিত করে। এই অ্যাপ্লিকেশন তার ব্যবহারকারীদেরকে মুসলিম রমণী ক্রয়-বিক্রয়ের একটি মিথ্যা প্লাটফর্ম তৈরি করে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

প্রকৃতপক্ষে এটা কোন সওদা না, কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনের উদ্দেশ্য মুসলিমদেরকে এবং বিশেষত মুসলিম মা-বোনদেরকে লাঞ্ছিত ও কটাক্ষ করা। এরূপ bully buy নামক আরেকটি অ্যাপ ২০২১ সালের নভেম্বরে চালু করা হয়। ঐ অ্যাপটিও মুসলিম মা -বোনদের ছবি নিয়ে প্রোফাইল বানিয়ে মুসলিম মা-বোনদেরকে লাঞ্ছিত ও কটাক্ষ করত।

সুল্লি এবং বুল্লি প্রকৃতপক্ষে মুসলিম মা-বোনদের জন্য ব্যবহৃত বিদ্রূপাত্মক দুটো শব্দ যা মুল্লি শব্দের বিকৃত রূপ। ভারতে ঠাট্টা করে মুসলিম পুরুষদেরকে মোল্লা এবং মুসলিম মা-বোনদেরকে মুল্লি বলা হয়।

এই অ্যাপসের সঙ্গে যুক্তরা সকলেই পড়ালেখা জানা যুবক এবং মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এই অ্যাপস ডেভেলপার এবং প্রচারকারীদের মাঝে ১৮ বছর বয়সী একটি হিন্দু মেয়ে রয়েছে। যার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, এটা নিছক 'নারীবিদ্বেষী পুরুষতান্ত্রিক' আচরণ না, বরং আমভাবে মুসলিমদেরকে এবং বিশেষভাবে মুসলিম নারীদেরকে কটাক্ষ ও লাঞ্ছিত করার প্ল্যাটফর্ম হল এই অ্যাপসগুলো। মুসলিম নারীদেরকে বাজারজাত পণ্য হিসাবে উপস্থাপন করা অর্থাৎ তাদেরকে এমন করে দেখান যে – তাদেরকে কেনা-বেচা করা যায়। এটি মুসলিম মা-বোনদেরকে মানবিক মর্যাদার স্তর থেকে নামিয়ে ঘৃণিত-লাঞ্ছিত করার অপচেষ্টা নয় কী?!

মুসলিমদেরকে মানবিক গুণাবলী থেকে অবমুক্ত করে পশু-জানোয়ার থেকেও নিকৃষ্ট আখ্যা দেয়া এবং তাদের সঙ্গে লাঞ্ছনাকর আচার-ব্যবহারের ধারা দীর্ঘদিন থেকে ভারতে চলছে।

রুয়ান্ডার গণহত্যার আগে সংখ্যালঘু 'তুতসি গোষ্ঠীর' লোকদেরকে বলা হত তেলাপোকা বা আরশোলা। পরবর্তীতে এই সম্প্রদায়ের লাখ লাখ সদস্যকে হত্যা করা হয়। নাৎসি জার্মানিতে ইহুদীদেরকে বলা হত ইঁদুর। এমনিভাবেই বিজেপি ও আরএসএস কর্মীরা দীর্ঘদিন যাবত মুসলিমদেরকে বোঝানোর জন্য 'উইপোকা' ট্যাগ ব্যবহার করছে। তাদের দৃষ্টিতে মুসলিমরা 'উইপোকা' – যারা ভারতের সম্পদ নষ্ট করছে এবং হিন্দুদেরকে তাদের ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। ভারতের দ্বিতীয় শক্তিধর রাজনীতিবিদ নেতা অমিত শাহ অধিকাংশ সময় এ-ই পরিভাষাই মুসলিমদের জন্য ব্যবহার করে ।

এসব পন্থা ও হাতিয়ারের মাধ্যমেই মুসলিমদেরকে মানবিক মর্যাদার স্তর থেকে নামিয়ে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। জনমানুষের মাঝে তাদের ব্যাপারে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অনুভূতি ও ঘৃণার ভাব উদ্রেক করা হচ্ছে। নেতিবাচক এই আবেগ অনুভূতিগুলোই পরবর্তীকালে গণহত্যার জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে অ্যাপসের মতই ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়াতেও হিন্দুত্ববাদী একটি শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ট্রেন্ড তৈরি করা হয়। নির্বিঘ্নে ও খোলাখুলি তাতে মুসলিম সাধারণ যুবকদেরকে হত্যা করা এবং মুসলিম মা-বোনদের সঙ্গে দলগত অনাচারের আহ্বান দেয়া হয়। আর এসব চিন্তাধারা প্রচারকারীরা শিক্ষিত এবং সামাজিকভাবে মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। শুধু তাই নয়, বরং কখনও কখনও এমনও চিন্তা প্রকাশ করা হয় যে, মোদি এবং বিজেপি মুসলিমদের সঙ্গে অত্যন্ত নমনীয় আচরণ করছে।

এছাড়া সরকারিভাবেও বিজেপি আরএসএস অত্যন্ত দক্ষভাবে প্রোপাগান্ডা করার পন্থা তৈরি করে দিচ্ছে। অত্যন্ত সুনিপুণ ও সংগঠিতভাবে ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। তাতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো ও গণহত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাঠ প্রস্তুত করা হচ্ছে। মিথ্যা সংবাদের মাধ্যমে জাতিগত নিধনের পালে হাওয়া দিয়ে এই আহ্বানকে ব্যাপক করা হচ্ছে। প্রোপাগান্ডার এই জাল বিছানোর প্রক্রিয়ায় বাস্তবেই লক্ষ লক্ষ লোক শামিল, যারা বিজেপি আরএসএস-এর সঙ্গে সংযুক্ত। এরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দিনরাত ক্রমাগত জাতিগত নিধন এজেন্ডা অগ্রসর করার মিশনে নিয়োজিত।

অমিত শাহ একবার বলেছিল, ‘আমরা জনসাধারণকে, আমাদের নিজেদের ইচ্ছা - আকাঙ্ক্ষার যেকোন পয়গাম শোনাতে সক্ষম। চাই সেটা মিঠা হোক কিংবা তেতো। সত্য হোক কিংবা মিথ্যা। কারণ আমাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ৩২ লাখ সদস্য রয়েছে।’

শুধু তাই নয়, ইন্টারনেটে সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ডসকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যবহারের জন্য ‘Tek Fog’-এর মত গোপন অ্যাপও ব্যবহারে আনা হয়। এই অ্যাপ ফেসবুক ও টুইটারের ট্রেন্ডসে নিজেদের পছন্দসই বক্তব্য নিয়ে আসে। এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য এই অ্যাপের ভেতর থাকা ‘অটো রিটুইট’ ও ‘অটো শেয়ার’- এর মত ফিচার ব্যবহার করে নির্বাচিত আইডি ও গ্রুপের পোস্ট এবং টুইটসমূহ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

এমনিভাবে ঐ অ্যাপ নিয়ন্ত্রণকারী অন্যান্য একাউন্ট ব্যবহার করে প্রথম থেকেই হ্যাশট্যাগস স্প্যাম করে। এভাবেই এই ফিচারের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী পয়গাম ছড়িয়ে

দেয়ার মিশন চালানো হচ্ছে। এই অ্যাপ তার ব্যবহারকারীদেরকে, সাধারণ নাগরিকদের ডিএক্টিভ হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টগুলো হ্যাক করার এবং তাদের ফোন নাম্বারের মাধ্যমে তাদের কন্টাক্ট লিস্টে থাকা সদস্যদেরকে সহজে বার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা করে দেয়।

এই উদাহরণ থেকেই এ বিষয়টা সুস্পষ্ট হয় যে, মুসলিমদের জাতিগত নিধনের পরিকল্পনা সফল করার কার্যকরী প্রচেষ্টা কতটা সূক্ষ্ম, নিপুণ ও গভীরভাবে করা হচ্ছে। এটা কেবল প্রান্তিক ধারার বিচ্ছিন্নতাবাদী অল্প কিছু লোকের কাজ নয়; বরং এটা সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধ। এটি তৃণমূল পর্যায় থেকেই তৈরি করা গণহত্যার এমন এক রক্তাক্ত ব্যবস্থা, যা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, আকর্ষণীয় আঙ্গিকে বাস্তব প্রেক্ষাপটে আনা হয়।

বাস্তবিকপক্ষে হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের সামনে উদাহরণ হিসেবে রাম জন্মভূমির আন্দোলন আছে, যে আন্দোলনের দ্বারাই বাবরি মসজিদের শাহাদাতের রক্ত মাখা ঘটনা ঘটে। হিন্দুত্ববাদীরা আরও একবার ঐ পথে চলে এমন সাফল্য অর্জন করতে চায়। পার্থক্য শুধু এই যে, এবার ব্যাপক পরিসরে, গণহারে তারা মুসলিমদেরকে হত্যা ও জাতিগত নিধন করতে ইচ্ছুক। সারাদেশে ধর্ম সংসদ অনুষ্ঠান করে তারা জনসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে সশস্ত্র ও প্রশিক্ষিত মিলিশিয়া হিসেবে গড়ে তুলে ময়দানে আনতে চায়। তাদের জন্য এ কাজ আরও সহজ হয়েছে এই কারণে যে, আরএসএস এবং তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সংগঠনগুলো আগে থেকেই পুরো ভারতে বড় পরিসরে তাদের সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক বিস্তার করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

তাদের এসব কার্যক্রমই আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদেরকে মুসলিম নিধনের জন্য প্রস্তুত মনে করছে। তারা অতি শীঘ্রই জাতিগত নিধনের পরিকল্পনার চূড়ান্ত অংশকে বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে।

সমাধান কি?

উপমহাদেশের মুসলিমদের রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের চিন্তার একটি মৌলিক সমস্যা হল, গণতন্ত্র ও উদার গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের ব্যাপারে তাদের অবিশ্বাস্য ও অটল আস্থা-বিশ্বাস আছে। বিগত এক শত বছর যাবত উপমহাদেশের মুসলিমদের রাজনীতিক অভিব্যক্তি – গণতন্ত্র, ইলেকশন ও জাতীয় সীমানাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। এমনকি আজও, যখন মুসলিমরা জাতিগত নিধনের শিকার হওয়ার জোরালো আশঙ্কার মুখোমুখি, তখনও তারা কাফিরদের তৈরি করা দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নিজেদের সমস্যার সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের এ বোধ নেই যে, এসব দৃষ্টিভঙ্গী ও ফর্মুলা বরাবরই মুসলিমদের ক্ষতি করছে এবং ভবিষ্যতেও ক্ষতি করবে। এসব পদ্ধতি, পন্থা, নিয়ামক সূত্রের দ্বারা কখনই মুসলিমদের কোন কল্যাণ সাধিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। এতদসত্ত্বেও মুসলিমদের এক বিরাট জনসংখ্যা যাদের মাঝে দুর্ভাগ্যবশত উলামায়ে দ্বীনেরও বিরাট অংশ আছেন, তাঁরা এসব ক্ষতিকর চিন্তাধারাই পোষণ করছেন।

গণতন্ত্র কখনই মুসলিমদের সমস্যার সমাধান করতে পারে না। ভারতের বর্তমান প্রেক্ষাপটই একথার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিজেপি, আরএসএস ভোটের আধিক্যের ভিত্তিতেই লাগাতার দু’বার ক্ষমতায় আসে।আর এই প্রেক্ষাপট থেকে বের হওয়ার কোনো গণতান্ত্রিক পথ বা সমাধান নেই। পূর্বে ভারতের বাহ্যিক সেক্যুলার আইন ও সংবিধানের ওপর অনেকেই নির্ভর করেছিল। অনেকেই নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আদালত ও পার্লামেন্টের মত সেক্যুলার সংস্থার সঙ্গে জুড়ায় তাদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের আশায়। কিন্তু মুসলিমদের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা বারংবার খামখেয়ালি বলেই প্রমাণিত হয়।

বাবরি মসজিদের শাহাদাত পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে আমরা দেখি যে, হিন্দুস্তানের সেক্যুলার ক্ষমতার অংশীদার ‘বিচারক শ্রেণি’ কীভাবে হিন্দুত্ববাদীদের সকল আন্দোলন ও কার্যক্রমকে আইনত পুরস্কৃত করে। আবার ঐ সেক্যুলার আদালতই কাশ্মীরের আটবছর বয়সী আসিফা বানুর সঙ্গে অন্যায় করে এবং তার হত্যাকারীদেরকে জামিনে মুক্তি দেয়।

বাস্তবে হিন্দুস্তানের বাহ্যিক সেক্যুলার সংস্থাগুলোর অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হল, হিন্দুত্ববাদীদের সমালোচিত কার্যক্রমগুলোকে আইনত সহায়তা দেয়া। প্রতিষ্ঠালগ্ন

থেকে আজ পর্যন্ত এই সংস্থাগুলো এমনটাই করে আসছে। গোটা শাসনব্যবস্থা এবং আমলাতন্ত্র; অর্থাৎ আদালত থেকে পার্লামেন্ট, পুলিশ প্রশাসন থেকে সশস্ত্রবাহিনী —সর্বত্রই এই হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করে যাচ্ছে। কোথাও সরাসরি ঘোষণাসহ অংশগ্রহণ করে, আবার কোথাও মৌন সমর্থন ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়।

এই পুরো দৃশ্যপট দেখার পর হিন্দুস্তানের মুসলিম উলামায়ে কিরাম ও নেতৃবৃন্দ... বিশেষত রাজনীতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের জন্য এই সেক্যুলার ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা জুড়ে দেয়া, এগুলোর প্রতি আস্থা পোষণ করা, তাদের কাছেই আর্জি পেশ করা একদিকে যেমন অযৌক্তিক, অপরদিকে সীমাহীন বেদনাদায়কও। তারা আজও মনে করে, সেক্যুলার ভারত তাদেরকে হিন্দুত্ববাদের শয়তানগুলোর হাত থেকে বাঁচাবে। এই চিন্তা এতটাই প্রভাবশালী যে, হরিদ্বারের সভাকে সমালোচনা করে তারা সেক্যুলার শাসকদের কাছেই বিচার নিয়ে যায়। যেন তারা বিক্ষুব্ধ এই পরিস্থিতিকে যেকোনভাবে নিজেদের জন্য অনুকূল করতে পারে (!)।

এই চিন্তাধারা আমাদেরকে আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা আজও মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বাস্তবতার চশমার ফ্রেমে আবদ্ধ হয়ে রাজনীতি করছি। এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছি না যে, এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতি আমাদের অধিকার, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করতে একেবারেই অক্ষম। উপমহাদেশের মুসলিমরা শরীয়তের বাস্তবায়ন, সম্মান ও মর্যাদার জীবনই প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু আজ পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ— তথা পুরো উপমহাদেশেই মুসলিমরা লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার। ইসলামের পতাকা আজ ভূলুণ্ঠিত। ক্ষমতার লাঠি হয় মুশরিকগোষ্ঠীর হাতে কিংবা জাতীয়তাবাদের পূজারী সেক্যুলারগোষ্ঠীর হাতে।

পৃথিবীতে আল্লাহর কানুন ও শরীয়ত বাস্তবায়নের দাওয়াত দেয়া তো দূরের কথা, এ বিষয়ের স্বপ্ন লালন করাও আজ নিষিদ্ধ। শত বছর যাবত আমরা যে নেশায় মত্ত এবং ক্রমাগত প্রতারিত ও বঞ্চিত, সে নেশার ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠাই– এখন সময়ের দাবি।

প্রয়োজনবশত, গণতন্ত্র ও ইলেকশনে অংশ নেয়ার পেছনে যদিও ভাল নিয়ত ও সদিচ্ছা কার্যকর থাকে, তবুও এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে ক্রমাগত নানা সমস্যা এবং নানাবিধ বিপদ ছাড়া আর কিছুই উপহার দিচ্ছে না। সেই সঙ্গে এগুলোর ধ্বংসাত্মক ফলাফল তো আছেই। এগুলোর দ্বারা সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি এই হচ্ছে যে, এতে উপমহাদেশের মুসলিমদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত ও মনস্তাত্ত্বিক দাসত্বই জেঁকে বসেছে। পরাজিত এই মানসিকতা মুসলিমদের রাজনীতিক চিন্তাধারার সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত যে, অধিকাংশ রাজনীতিক-ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠী গণতন্ত্র ছাড়া আর কোন সমাধান দেখতে পায় না। বরং কল্পনায় বিকল্প চিন্তা কিংবা ধারাকে ধারণ করতে আগ্রহী না।

আজ ভারতের বিশ কোটি মুসলিম জনসংখ্যা জাতিগত নিধনের সীমাহীন ভয়াবহতার মুখোমুখি। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান ব্যবস্থায় আমাদেরকে পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনীতিক চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনতে হবে, যা আমাদেরকে আজ এ পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে। মুসলিম জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য, মুসলিম মা-বোনদের সম্মান ও সম্ভ্রম হিফাজতের জন্য, নিজেদের হারানো ভূমি পুনরুদ্ধার করে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার জন্য এবং সর্বোপরি আল্লাহর দ্বীনের পতাকা সমুন্নত করার জন্যও আজ উপমহাদেশের মুসলিমদের স্বার্থেই একটি নতুন রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যবশত, মুসলিমদের এক বিরাট অংশ আজও, এই নাজুক ক্রান্তিকালেও নিজেদেরকে জিহাদ থেকে দূরে রাখতে আগ্রহী। এই কর্মপন্থা না তাদেরকে হিফাজত করতে পারবে, আর না তাদেরকে মুশরিকগোষ্ঠীর কাছে আস্থাভাজন বানাতে পারবে। ধর্ম সংসদের বক্তা প্রবোধানন্দ গিরি পরবর্তীতে এক ইন্টারভিউতে বলে যে:

> "আমরা জিহাদিদেরকে শেষ করতে চাই। আর যারাই কুরআন পড়ে, এর অর্থ ও মর্ম বোঝে, তারা সকলেই জিহাদি।"

২০২১ সালে ঐ ব্যক্তিকেই এক অডিওতে বলতে দেখা যায়:

> “পুরো দুনিয়াতে যদি মানবতা(তাদের তথাকথিত মানবতা) রক্ষা করতে হয়, তাহলে জিহাদিদেরকে নিঃশেষ করতে হবে। পৃথিবীবাসীর জন্য এই জিহাদিদের চিকিৎসা করা এবং এদের কোন একটা ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। কিছুদিন আগে কেউ একজন বলেছিল যে, ‘ইসলামে ধর্ষক জন্ম নেয়, জিহাদি জন্ম নেয়’।... আর আমি তো অনেকদিন ধরেই বলছি যে, প্রতিটি মুসলিম ঘরানায় একটা জিহাদি ও সন্ত্রাসবাদী অংশ থাকে। হিন্দুদের এখন উঠে দাঁড়াবার এবং ঐ সকল জিহাদির চিকিৎসা-ব্যবস্থা করার সময় এসেছে। আর নয় তো এই জিহাদিরা হিন্দুদের জন্য ব্যবস্থা খুঁজে নেবে। তখন এই পৃথিবীতে বসবাসের জন্য আমাদের আর কোন জায়গা অবশিষ্ট থাকবে না।”

এ ব্যক্তি আরও অগ্রসর হয়ে সমস্ত জিহাদিকে হিন্দু ধর্মের প্রতি প্রত্যাবর্তনের এবং ক্ষমা প্রার্থনারও পরামর্শ দেয়। প্রিয় পাঠক চিন্তা করতে পারছেন, আপনি নিজেকে জিহাদ থেকে যতই দূরে রাখুন অথবা যত ভাবেই সেক্যুলার ও লিবারেল সাজার চেষ্টা করুন, শত্রু আপনাকে জিহাদি বলেই জ্ঞান করবে।

তাই হে মুসলিমরা! তোমরা শুনে রাখ। তোমরা তাদেরকে রাজি-খুশি করার যতই চেষ্টা কর না কেন, তোমরা যতই শান্তিবাদী সাজার চেষ্টা কর না কেন, তোমরা যতই সুনাগরিক হওয়ার চেষ্টা কর না কেন, তোমরা বরাবরই তাদের দৃষ্টিতে জিহাদি থাকবে। যতদিন তোমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত না হবে, যতদিন তোমরা আল্লাহর দ্বীনকে ভালবাসবে, ততদিন তোমরা তাদের দৃষ্টিতে জিহাদি পরিচয় মুছতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে এবং মিল্লাতে ইব্রাহীম পরিত্যাগ করে তাদের ধর্মাদর্শে চলে না যাবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে রাজি-খুশি করতে পারবে না।

চিন্তাশীলদের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষা। গণতন্ত্র, নির্বাচন, জাতীয়তার পূজা, সেক্যুলারিজম ও মানব রচিত কৃত্রিম রাষ্ট্রীয় সীমান্তের জঞ্জাল থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য, নিজেদের ঈমান, মান-মর্যাদা, সন্তান-সন্ততি ও অনাগত প্রজন্মের হিফাজতের জন্য আমাদেরকে একটি নতুন রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি, যার ভিত্তি হবে জিহাদ ও শরীয়ত; যেমনটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,

খোলাফায়ে রাশেদীন রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং পরবর্তীতে অন্যান্য খলিফা ও সুলতানদের আমলে ছিল।

১৯৪৭ এবং ১৯৭১-এর রাজনীতিক আঙ্গিকে নিজেদেরকে আবদ্ধ করে চিন্তা করার সময় পার হয়েছে। এখন প্রয়োজন হল গোটা হিন্দুস্তানকে বিরাট একটি ময়দানরূপে মূল্যায়ন করে পরিকল্পনা করার। কারণ উপমহাদেশের মুসলিমদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ পরস্পরে জড়িত। পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশের একটিকে অপরটির থেকে আলাদা করে দেখা যাবে না। হ্যাঁ , একথা ঠিক, আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট এবং বাস্তব পরিস্থিতি অবশ্যই প্রত্যেক এলাকায় বিভিন্ন হতে পারে। তাই এমন কৌশল ও সমন্বয়-পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে, যা আঞ্চলিক অবস্থার সঙ্গে জুতসই হবে। আর সেই সঙ্গে অবশ্যই একটি কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আর কেন্দ্রীয় সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল, উপমহাদেশের স্বাধীনতা এবং গোটা উপমহাদেশে আল্লাহর শরীয়তের বাস্তবায়ন। আর এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন শুধু জিহাদের মাধ্যমেই সম্ভবপর হতে পারে। আল্লাহর কিতাব আমাদেরকে পথ দেখাবে আর তরবারি সাহায্য করবে। আর এটাই হল সেই গাযওয়াতুল হিন্দ, যা উম্মাহর জন্য সুসংবাদ বয়ে আনবে যেমনটা সত্যবাদী ও সত্যায়িত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

মুশরিকদের পণ্ডিত ও সাধু-সন্তরা যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে। যেভাবে ঘৃণার চাষ করা হচ্ছে তাতে নতুন প্রজন্মের মাঝে ঘৃণার বীজ সঞ্চার হচ্ছে। আর মুসলিমদেরকে মূলোচ্ছেদ করার প্রস্তুতিও জোরেশোরে চলমান। ভারতের রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের গুরুগম্ভীর নীরবতা সেই প্রস্তুতির প্রতি সম্মতি ও সমর্থনের লক্ষণ। জাতিগত নিধনের এই ডাক এবং তার জন্য বিভিন্ন প্রস্তুতি ভবিষ্যতে আরও বেড়ে যাবে। আমরা আর কতদিন নিজেদের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে, আসন্ন ভয়াবহতার ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকব?

যদি হিন্দুস্তানের হিন্দুত্ববাদী এই আন্দোলনের জবাব দেয়া না হয় এবং এভাবেই এই আন্দোলন অগ্রসর হতে থাকে, তাহলে হিন্দুস্তানের মুসলিমদের পরিণতি বসনিয়া ও মায়ানমারের মুসলিমদের চেয়েও শোচনীয় হওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে।

উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে জিহাদের পথকে আপন করে নিতে হবে। মুজাহিদীন ছাড়া আজ আর কে আছে, যারা আমাদের কল্যাণের জন্য লড়াই করবে? নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করবে? নিজেদের রক্ত ঝরাবে?

মুজাহিদ আলিম, উপমহাদেশের জিহাদের রাহবার শাইখ আসিম উমর বলেছিলেন:

> "যদি হিন্দুস্তানের মুসলিমরা আপন মুজাহিদ ভাইদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানায়, তবে মুজাহিদীন প্রত্যেক মুসলিমদের বিরুদ্ধে উঠানো যেকোন হাত কেটে রেখে দিবে।"

কিন্তু হে ভারতের মুসলিমরা! সর্বপ্রথম আমাদেরকে এই মৌলিক বাস্তবতা অনুধাবন করতে হবে যে, মুজাহিদরা তখনই আমাদেরকে সাহায্য করতে সমর্থ হবেন, যখন আমরা নিজেরা সাহায্য লাভ করতে চাইব। যতদিন আমরা নিজেরা বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার সাহস ও প্রত্যয় সৃষ্টি করতে না পারব, আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ করার জন্য তাঁর কাছে একনিষ্ঠতা ও নিজেদের ব্যর্থতা জাহির করে ফিরে না আসব, ততদিন পর্যন্ত অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার নয়। আমাদেরকে সেই সীরাতে মুস্তাকিমের ওপর চলতে হবে, যা ধরে চলার নির্দেশ আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, মালিকুল মুলক, আল-জাব্বার, আল-মুতাকাব্বিরের ফরমান আমাদের স্মরণ করা উচিত। তিনি এরশাদ করেছেন:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ: "তোমাদের উপর কিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়ত কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়ত বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা আল বাকারা ২:২১৬)

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুত, তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে।" (সূরা আল আনফাল ৮:২৪)

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

অর্থ: "আর প্রস্তুত কর তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুত, যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।" (সূরা আল আনফাল ৮:৬০)

ভারতের মুশরিকরা আমাদেরকে ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। অপরদিকে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মান-মর্যাদা ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমরা কি নিজেদের রবের আনুগত্য করব না?

আজও কি আমরা জেগে উঠব না?

হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন... আমি আমার সম্প্রদায়ের নিকট বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। আমি আপন কওমের নিকট পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি।

—

ভাই ‘আবু আনোয়ার আল-হিন্দি’ হাজী শরীয়তুল্লাহ’র ভূমি বাঙাল অঞ্চলের অধিবাসী; বর্তমানে এটি বাংলাদেশ নামে পরিচিত। আর সেখানেই তিনি এ প্রবন্ধ রচনা করেন।

****